ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-I, September, 2024, Page No. 68-75
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.01W.010

দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃত্তান্ত’ উপন্যাসের চ্যারকেটু চরিত্র: নিম্নবর্গীয় চরিত্রের আধারে একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. জানকী প্রসাদ দেবনাথ, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মার্ঘেরিটা কলেজ, আসাম, ভারত*
E mail: debnathjanaki@gmail.com

Received: 08.09.2024; Accepted: 28.09.2024; Available online: 30.09.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

"Mofossoli Brithanto," a significant novel by Debesh Roy, explores the lives of people in North Bengal. Written in 1974, the novel highlights the tragic history of a Rajbanshi family from the remote village of Dwarikamari in the Jalpaiguri district. The narrative is filled with the clamor of the marginalized lower-class communities. It can be said that "Mofossoli Brithanto" recounts the sorrowful stories of those oppressed and crushed by the history of power. It also depicts the life of a family that has become destitute under the pressures of overlooked and unacknowledged capitalist class struggles in the mofussil (rural) areas.

In this backdrop, Debesh Roy brings to light the poignant history of the neglected and overlooked agricultural laborers. The protagonist, Khetkhetu, lives with his wife, Tultuli, his nephew, Chyaraketu, and their three children: two sons, Baishakhu and Bengu, and a daughter, Kheteshwari. Structured in eight chapters, each part of the novel is almost self-contained. The characters include Khetkhetu, Chyaraketu, Tultuli, Bengu, Baishakhu, and Kheteshwari, representing various aspects of the lower class.

In Bengali prose literature, there has been a movement to portray the joys, sorrows, protests, and resistances of the lowest strata of society – those who are marginal, neglected, and downtrodden. Debesh Roy further advanced this exploration, transcending the social, economic, historical, and geographical boundaries of Bengal to reach the remote regions of rural India. He aimed to give people their dignity and highlighted the voice from the margins or history from below in the narrative of the novel.

Now, we will try to understand how these characters fit the definitions provided by theorists of the lower class, exploring how and why they embody the characteristics of lower-class figures.

উত্তরবঙ্গের জনজীবনকে নিয়ে লেখা দেবেশ রায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'। উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৭৪ সাল । আলোচ্য উপন্যাসে দেবেশ রায় তুলে ধরেছেন উওরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার এক প্রত্যন্ত দ্বারিকামারি গ্রামের একটি রাজবংশী পরিবারের করুণ ইতিহাসকে। এই উপন্যাসের প্রতিবদনে ভিড় করে আছে অণ্ডেবাসী নিম্নবর্গীয় মানুষের কোলাহল। বলাযেতে পারে 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসটি হল প্রতাপের ইতিহাস দ্বারা নিপীড়ীত, নিষ্পেষীত হওয়া মানুষের করুণ কাহিনি। মফস্বলের উপেক্ষিত, অনালোচিত, অনালোকিত পুঁজিবাদী শ্রেণি সংগ্রামের কবলে পড়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া একটি পরিবারের জীবন আলেখ্যও বলা যেতে পারে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে দেবেশ রায় তুলে এনেছেন এক অবহেলিত উপেক্ষিত আধিয়ার বা ভাগচাষী খেতখেতুর দারিদ্রময় জীবনের করুণ ইতিহাসকে। খেতখেতু ছাড়াও তার সংসারে রয়েছে স্ত্রী টুলটুলি, ভাইপো চ্যারকেটু, তিন শিশুসন্তান দুই ছেলে বৈশাখু, বেঙু এবং মেয়ে খেতেশ্বরী। আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। উপন্যাসটির প্রকাশ সর্ম্পকে দেবেশ রায় জানিয়েছেন-

> *'"মফস্বলি বৃত্তান্তর- উপন্যাসটি লিখেছিলাম টানা মাস-দুই গরমে, ৭৪- এ। লেখা শেষ হতে না-হতেই জলপাইগুড়ির এক আড্ডায় পড়তে হল। পড়তে ডেকেছেন আর পড়াটা আমার দরকারও বটে - তাই বলে তো গোটা একটা নভেল পড়া যায় না। তাই, সেই আড্ডার মানানসই একটা ধরন খুঁজে বের করতে হল বা বানাতে হল। পরপরই এল দীপেনের পোস্টকার্ড -(দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)- শারদীয় 'কালান্তর'- এর জন্য উপন্যাসের আদেশ। একে 'কালান্তর', তায় শারদীয়, তায় উপন্যাস, তায় দীপেন এতগুলো সতর্কতা চিহ্নের মধ্য দিয়ে বৈঠা বওয়া যে কত অসম্ভব তা যে না-ভুগেছে তার বাইরে কাউকে বোঝানোই সম্ভব না। তাই, সেই 'কালান্তর' -এর জন্যই আবার এক-রকমে 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'র গল্পটাকে দেখতে হল। আবার একটা নতুন ধরন বের করতে হল 'কালান্তর'- এর মানানসই।"'*[১]

উপন্যাসটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খণ্ডাকারে প্রকাশিত হলেও, প্রতিটি খণ্ডকে আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্রও রয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে দেবেশ রায় বেশকিছু নিম্নবর্গীয় চরিত্রকে তুলে ধরলেন। চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি যেন এই উপন্যাসে 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' রচনা করে চলেছেন। এই উপন্যাসে আমরা পাই খেতখেতু, চ্যারকেটু, টুলটুলি, বেঙ্গু, বৈশাখু ও খেতেশ্বরির মতো সমাজের নিম্নবর্গের বেশকিছু চরিত্রকে। বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজের একেবারে নিচুতলার সর্বহারা, প্রান্তিক, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, নিম্নবর্গীয় শ্রেণির সুখ-দুঃখ, প্রতিবাদ প্রতিরোধের রুপাঙ্কনের যে অভিযান শুরু হয়েছিল দেবেশ রায় তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক পরিসর অতিক্রম করে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। মানুষকে যেন মানুষের মর্যাদা দিতে চাইলেন। *voice from margin বা history from below* কে তুলে ধরলেন উপন্যাসের বয়ানে। এবারে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকেরা নিম্নবর্গের যে সংজ্ঞায়ন করেছেন, সেই সংজ্ঞায়নের ভিত্তিতে আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করব এরা কিভাবে, কেমন করে, এবং কেনই বা নিম্নবর্গ চরিত্র ।

দেবেশ রায় রচিত 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসের অন্যতম নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চ্যারকেটু চরিত্রটি । ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে চ্যারকেটুর বাসস্থান তথা গোয়াল ঘরে রাত্রি যাপনের কথা বর্ণনা করতে করতেই আমাদের সাথে পরিচয় ঘটিয়েছেন চ্যারকেটু চরিত্রটিকে। এই চ্যারকেটু চরিত্র অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাত, চাওয়া-না পাওয়ার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করা একটি নিম্নবর্গীয় সমাজভুক্ত চরিত্র। উপন্যাসিক দেবেশ রায় তাঁর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে এই চ্যারকেটু চরিত্রটিকে আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বলা যেতে পারে এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র

চ্যারকেটু। উপন্যাসে তার পরিচয় সে খেতখেতুর ভাইপো। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা চ্যারকেটুকে দেখি গত তিনদিনের বাসি খিদে এবং আগামী কয়েকদিনের আগুরি ক্ষিদের যন্ত্রণার হাত থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য লড়াই করতে। আর্থিক অনটনের ফলে সামাজিক জীব হয়েও মানুষকে যে কত অসহনীয় পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে হয় তা চ্যারকেটুর দৈনন্দিন জীবন যাপন থেকেই পরিষ্কার ফুটে ওঠে। পুরনো জরাজীর্ণ চাল, ভাঙ্গা বেড়াযুক্ত গোয়াল ঘরই তার একমাত্র বাসস্থান। এইতো হল স্বল্পপরিসরে আমাদের আলোচ্য চ্যারকেটু চরিত্র। এবারে আমরা নিম্নবর্গের বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা নিম্নবর্গের যে সংজ্ঞায়ন করেছেন সেই সংজ্ঞায়ন অনুযায়ী নিম্নবর্গীয় চরিত্রকে দেবেশ রায় কেমন ভাবে আমাদের সামনে হাজির করেছেন সেদিকে দৃষ্টি ভঙ্গিতে চ্যারকেটু চরিত্রটিকে বিচার বিশ্লেষণ করবো।

উপন্যাসের কথাবয়ানে কথাকার দেবেশ রায় অত্যন্ত সচেতন ভাবে চ্যারকেটুর আর্থ সামাজিক দিকটিকে তুলে ধরেছেন । উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক চ্যারকেটুর বাসস্থান ও রাত্রিযাপনের পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে চ্যারকেটু চরিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন । উপন্যাসের বয়ানে পাই –

> "শুলেই তার হাত পা গুটিয়ে আসে, হাত পা গুটিয়ে আসে, হাত পা গুটিয়ে কোলের ভেতর ঘাড় গুঁজে ঘুমোতে হয় কারন মাচানটার লম্বালম্বি তার শরীরটা আঁটেনা, কারণ এখন কার্ত্তিক মাস চ্যারকেটুর গায়ে কোঁচার খুঁট,এরপর পৌষমাস। তাহলে আর শুয়ে শুয়ে চ্যারকেটু হাত পা টানটান করে কেমন করে। হাত পা টান টান করতে চ্যারকেটুকে দাঁড়াতেই হয়। আর যদি এই শেষরাতে মাচান থেকে নেমে হাত পা টান করে চ্যারকেটু দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তিন বছরের পুরনো ঝুরঝুরে খড়ের চালে তার আর চলেনা- তাহলে পুরুষানুক্রমিক আকাশটিকে মাথার ওপর দরকার হয়। তা সে কার্ত্তিকই হোক আর পোষই হোক।"[১]

চ্যারকেটু চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক প্রথমেই যেভাবে চরিত্রটিকে তুলে ধরলেন তার থেকে একথা স্পষ্ট যে চ্যারকেটুর বাসস্থান ও তার তার রাত্রিযাপন কোন স্বাভাবিক মানুষের নয়। তার তিন বছরের পুরনো ঝুরঝুরে চালের ইতিহাসটা যেমন তার দারিদ্রময় জীবনের মতই করুন ঠিক তেমনি তার রাত্রিযাপন নয় রীতিমত যুদ্ধে সামিল হবার সমান। বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে চ্যারকেটুকে রাত্রিযাপন করতে হয়। আর এখানেই আমরা দেখতে পাই যে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার পৌষ মাসেও চ্যারকেটুকে তার পরনের ধুতিটা জড়িয়েই ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন সতর্কতাকে সামনে রেখেই চ্যারকেটুকে রাত্রি যাপন করতে হয়। একে তো মাচান তাও আবার গোয়াল ঘরের এককোণে, তার উপর গাই-বাছুরের জন্য বরাদ্দ হাত-চারেক জায়গা। এমনি ভাবেই বিভিন্ন ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে চ্যারকেটুকে রাত্রিযাপন করতে হয়। তার মাচানটা পশ্চিম আর উত্তরে বেড়ার গা থেকে বেরিয়েছে কারণ এতে খানিকটা খরচ বেঁচেছে, এরজন্য বাড়তি খুঁটির খরচ লাগেনি । একবার পাটের চাষে লাভ হয়েছিল এবং সেই টাকা থেকে খরবরু মাষ্টারের তিন বছরের পুরনো চালটা কিনে এনে লাগায়। কথাকারের ভাষায়-

> "খরবরুর চালটাই ছিল প্রায় বছর তিনেক পুরনো আর তারপর আরো বছর তিনেক কেটেছে। এখন খড়গুলো পচে ঝুরঝুরে।"[২]

একদিকে খরবরু মাষ্টারের চালটা বছর তিনেকের পুরনো ছিল সেই চালটাকেই চ্যারকেটু এনে লাগায় তাদের গোয়াল ঘরে। কারণ এই পুরনো চালটা কিনতে তার কিছুটা অর্থ কম লেগেছে। নুতন চাল কিনে এনে লাগাবার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা চ্যারকেটুর নেই। ঔপন্যাসিক আসলে ভারতীয় সভ্যতার দারিদ্রের রূপরেখাটি খুব ভালো করেই জানতেন, শুধু অনুভবে নয়, আসলে বাস্তবকেই অবলম্বন করে তিনি পথ চলতে ভালোবাসতেন। তাইতো তিনি চ্যারকেটুদের তিনদিনের ক্ষিদের বর্ণনার পাশাপাশি তাদের থাকার ঘরের বর্ণনা দিতেও অস্বস্তি বোধ করেননি। তাইতো কথাকার জানান –

"এই শীতে ঘরের চাল না পাল্টালে ফাল্গুন-চৈত্রের ঝড়-বাতাসে চাল উড়ে গিয়ে চাঁদনি রাত,দিনের রৌদ্র আর জ্যোৎস্নার বানভাসি আকাশের সাথে চ্যারকেটুর তৈরি হবে দিগন্তব্যাপী মেলবন্ধন।"[৩]

আসলে চ্যারকেটুর গোয়াল ঘরের চালের এত নিখুঁত বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেন আমাদের সমাজের পিছিয়ে পড়া,নিম্নবর্গের মানুষেরা অর্থনৈতিক মানদণ্ডের দিক থেকে কতোটা পিছিয়ে থাকতে পারে তারই চরম বাস্তব ছবিকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন দেবেশ রায় ।

গত তিনদিনের বাসি ক্ষিদের অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যেও তাই চ্যারকেটুকে শীতের প্রকোপ থেকে, ঝড়ের প্রকোপ থেকে এমনকি রোদের প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভাবতে হয়। কিন্তু গত তিনদিন থেকে যাদের মুখে একমুঠো ভাত জোটেনি সেই দীন-দরিদ্র মানুষগুলো তাদের বাসস্থানের জন্য এরথেকে বেশি আর কতটুকুইবা ভাবতে পারে? তবুও চ্যারকেটুকে গোয়াল ঘর ঠিক রাখবার কথা ভাবতেই হয় কেননা এই গরুর বাসস্থানই যে তারও বাসস্থান। আবার এই বাসস্থানের জাগাটুকুও তাদের নিজস্ব নয় এই জায়গার মালিক তার গিরি। নির্দিষ্ট সময়ে গিরির ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে সেখান থেকেও উচ্ছেদ হতে হবে। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের জীবনে বেঁচে থাকবার জন্যে যে কত ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হয় তারই বাস্তব রুপায়ন এই উপন্যাস। জীবনে বেঁচে থাকবার জন্যে নিম্নবর্গের মানুষদের কখনো কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় উচ্চবর্গের মানুষদের থেকে সহানুভূতি পেতে হলে আর চ্যারকেটুও অঞ্চল অফিস থেকে পোস্টার সংগ্রহের সময়ে কিছুটা মিথ্যের আশ্রয় নেয়। শেষ পর্যন্ত অন্যকোন উপায় নাপেয়ে সে বিভিন্ন সরকারি পোস্টার ও হ্যান্ডবিল সংগ্রহ করে ঘড়ের বেড়ায় লাগিয়ে ঠাণ্ডা তথা বৃষ্টির প্রকোপ থেকে নিজেকে কিছুটা বাঁচাতে চায়। দীর্ঘক্ষণ চ্যারকেটু সেক্রেটারিকে সাথে যুক্তি তর্কের পর চ্যারকেটু দুটো পোষ্টার পায় এবং তা গোয়াল ঘরের ভাঙ্গা বেড়াগুলোতে লাগায়। এইতো হল আমাদের চ্যারকেটু চরিত্রের আর্থিক সামাজিক অবস্থান। এত সমস্ত কিছু জেনেও কি আমরা চ্যারকেটু চরিত্রটিকে নিম্নবর্গের মধ্যেও নিম্নবর্গ বলতে পারিনা?

'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসে দেবেশ রায় সমাজের দুই বিপরীত শ্রেণির মানুষকে তুলে ধরেছেন। একদিকে সমাজের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের উপস্থিতি যাদের নাআছে অর্থের অভাব না আছে খাদ্যের অভাব। আর তার বিপরীতে খেতখেতুর মতো অসহায় নিম্নবর্গের মানুষদেরকে যারা নাখেতে পেয়ে খাদ্যের অভাবে মৃত্যুর দিকে যাত্রা করছে। এই নিম্নবর্গের মানুষেরা সবটা সময় শুধুমাত্র উচ্চবর্গের শাসন-শোষণকে মেনে নিয়ে তাদের অনুগত হয়েই থাকেনি । ক্ষেত্র বিশেষে তারাও উচ্চবর্গের প্রতি হয়ে উঠেছে প্রতিবাদী। সেই নিম্নবর্গের চেতনার জায়গা থেকেও দেবেশ রায় চ্যারকেটু চরিত্রটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ।

আর এই অমানবিক,অসহায় পরিস্থিতিতে খেতখেতুর দিনের পর দিন খাদ্যের অভাবে শুধুমাত্র জল খেয়ে দিন কাটানোর মধ্য দিয়েও সে যেন সমাজের উচ্চবর্গ তথা ক্ষমতাসীনদের সমাজকেই প্রত্যাখ্যান করে। আলোচ্য উপন্যাসে আমরা দেখি চ্যারকেটু তার গোয়াল ঘরের ঝুরঝুরে ভাঙ্গা বেড়াকে কিছুটা ঢাকবার জন্যে অঞ্চল অফিস থেকে পোস্টার সংগ্রহ করতে যায়। পোষ্টার সংগ্রহের ক্ষেত্রে কার্যসিদ্ধির জন্য চ্যারকেটু কিছুটা মিথ্যের আশ্রয়ও নেয়। শেষ পর্যন্ত অন্যকোন উপায় নাপেয়ে সে বিভিন্ন সরকারী পোস্টার ও হ্যান্ডবিল সংগ্রহ করে ঘড়ের বেড়ায় লাগিয়ে ঠাণ্ডা তথা বৃষ্টির প্রকোপ থেকে নিজেকে কিছুটা বাঁচাতে চায়। চ্যারকেটু অঞ্চল অফিসের সেক্রেটারিকে বলে-

"হে বাবু মোক দুইটা পোস্টার দাও কেনে।"[৪]

সেক্রেটারি লিখতে লিখতে আভিজাত্যের সুরে উত্তর দেয়-

"যা যা, এই পোস্টার নিয়া তুই কী করবু?"[৫]

উত্তরে চ্যারকেটু বলে -

"হ-অ-য় । নিয়া যাম । ট্যাঙ্গাম ঘরঠে,"[৬]

চ্যারকেটুর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সেক্রেটারির মুখের উপর জবাব দিলে তার আধিপত্যের অহমিকা কিছুটা আঘাত প্রাপ্ত হলে সেক্রেটারি দৃঢ়টা ও ব্যঙ্গের সঙ্গে তাকে বলে-

"তর দারিঘরত ত রোজই পঞ্চায়েত বসিবার ধরিছে , না? তর ঘড়ত ত তুই আর গরুখান দেখিবি, আর কায় দেখিবে? [৭]

চ্যারকেটু সেক্রেটারির কটুকথাতে বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ নাকরে আবার বলে -

"বাহারঠে টাঙ্গাম। সগায় দেখিবে।"[৮]

চ্যারকেটু আগে থেকেই ভেবে নিয়েছিল যে যেমন করেই হোক তার পোষ্টার সংগ্রহ করতেই হবে আর তাই সে সেক্রেটারির কোন কটুকথাতেই হার নামেনে সে বরঞ্চ একের পর এক যুক্তিকে দাঁড় করিয়েছে তার পক্ষে এবং শেষ পর্যন্ত পোষ্টার সংগ্রহ করতে পেরেছে। এই কথপোকথনের মধ্যে থেকে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি যে এখানে দেবেশ রায় সমাজের দুই শ্রেণির মানুষের কথাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন, একদিকে সমাজের ক্ষমতাগর্বী, আধিপত্যবাদী চরিত্র অঞ্চল অফিসের সেক্রেটারি আর তার বিপরীতে সমাজের প্রান্তিকায়িত শ্রেণির প্রতিনিধি চ্যারকেটু। এই প্রান্তিকায়িত মানুষেরাও যে কথা বলতে পারে, পারে উচ্চবর্গের যুক্তির প্রত্যুত্তরে যুক্তি দেখাতে সেই চিত্রকেই চ্যারকেটুর পোষ্টার সংগ্রহের মধ্যদিয়ে দেবেশ রায় আমাদের সামনে তুলে ধরলেন ।

আর এখানেই আমরা দেখতে পাই চ্যারকেটুও কথা বলতে জানে সেও প্রত্যাখ্যান করে উচ্চবর্গের উন্নয়নকে যা তার জীবনের সাথে একেবারেই বেমানান কারন যে সব পোস্টার সে তার ঘড়ের বেড়াতে লাগাবার জন্যে অঞ্চল অফিস থেকে জোগাড় করেছিল তার মধ্যে ছিল পরিবার পরিকল্পনা, বসন্ত রোগ নির্মূল করন, সার, পাম্প, অধিক ফলনশীল ধান, সমবায় সপ্তাহ, জোড়া বলদ, ধানের শিষ, ইন্দিরা গান্ধী, হাতুড়ি তারা, গাই বাছুর, এত সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে যে ছবিটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে তাহলো ভারতবর্ষের উন্নয়ন আর উন্নয়ন। এখানে রয়েছে সচেতনতার ছবি, আর্থিক, সামাজিক, শারীরিক, রাজনৈতিক সমস্ত দিক থেকে সার্বিক উন্নয়নের ছবি আর এই উন্নয়নের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান চ্যারকেটুর। আর চ্যারকেটু যেন এইসব পোস্টার দিয়ে তার গোয়াল ঘড়ের বেড়া ঢাকার মধ্যে দিয়ে সমস্ত উন্নয়নকেই প্রত্যাখ্যান করতে চাইল, যে উন্নয়ন তার জীবনের সাথে একেবারেই মেলেনা। আসলে সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের বর্গ বা গণ্ডীর মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেও নিম্নবর্গের মানুষেরা তাকে সচেতন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করে ।

সাম্রাজ্যবাদী শোষকের প্রতিনিধিদের দ্বারা শোষিত হয়ে অভুক্ত মানুষেরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় পার্থিব চাহিদাকে অপার্থিব ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করার কত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে যে চিত্র এখানে ঔপন্যাসিক তুলেধরেছেন তা বর্তমান সময়ের নিরিখে অবিশ্বাস্য মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু লেখক যে সময়ের প্রেক্ষিতে লিখেছেন সেই সময়ে এর সত্যতা প্রশ্নাতীত। বরং বলা ভালো তার এই বর্ণনায় বাস্তবের বাইরে অতিকথন নেই। রয়েছে দরিদ্র-পীড়িত মানুষের যথাযথ রুপায়ণ। উপন্যাসে এই চ্যারকেটুকে আমরা দেখি ক্ষুধা ভুলবার জন্য সে তার চেতনাকে নিয়ে যেতে চায় অবচেতনায়।

চ্যারকেটু পেশায় আধিয়ার কৃষক। জোতদারের জমিতে তারা ফসল ফলায়। তাদের পেটে শেষবারের মতো ভাত জুটেছিল পরশুরাতে। তা আবার হাটে ঘটি বিক্রি করে। অর্থাৎ শেষ সম্বলটুকু বিসর্জনের মধ্যদিয়ে। ধান ক্ষেতের মধ্যেই যার ঘর, দুদিকে তাকালেই যার চোখে পড়ে শুধু ধান আর ধান, আর এত ধান থাকা সত্ত্বেও তাকে দিনের পর দিন ভাতের পরিবর্তে জল খেয়ে, উপোশ করে কাটাতে হয়। তাই চ্যারকেটু বলে–

"ভাত আর চাঁদ একো জিনিস, আকাশত্ থাকে মাঝরাতত্।"[৯]

তাই চ্যারকেটু তাকিয়ে থাকে ধান ক্ষেতের দিকে। যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় মাঠ ভর্তি ধান আর ধান। আর অন্যদিকে ঠিক সমপরিমানে খিদে চ্যারকেটুদের পেটে। ধান পেকে উঠতে এখনো তিন সপ্তাহ বাকি। চ্যারকেটুদের পাঁচ বিঘা আধিজমি। এই জমিতে চ্যারকেটু ও খেতখেতু ঘাম ঝরিয়ে ফসল ফলায়। তিন পুরুষ থেকে তাদের এই কৃষিকাজ চলে আসছে। জমিচাষ করে ভাগাভাগির পর তাদের ভাগ্যে যা জোটে তাতে তাদের অধিকাংশ দিনই নাখেয়ে দিন কাটাতে হয়। সারা বছরের খাবারের যোগান হয়না। চ্যারকেটু সেই ভাতের আশায় রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ধান ক্ষেতের দিকে। প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় দুই-চারটে ধান মুখে দিয়ে দেখে কোনরকমে তার থেকে চাল বের করা যায় কিনা। কিন্তু চ্যারকেটুর সেই সামান্যতম আশাও শেষ হয়ে যায়। তাই চ্যারকেটু বলে ওঠে –

"এই ধানত্ চাইল নাই । এই জোছনাত আইল নাই। এই প্যাটত ভাত নাই।"[১০]

তাইতো চ্যারকেটু জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে টিউবওয়েলের জল খেয়ে তার পেট ভর্তি করে। এরপর চ্যারকেটু কাজের সন্ধানে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলে খেতখেতু তাকে বলে-

"তুই গরুটা নিয়া যা কেনে।" সেই সঙ্গে এও বলে- "সদরত্ কায়ও কিনিবার চাহে, ত, বেচি দিস।"[১১]

এইতো হল আলোচ্য উপন্যাসের চ্যারকেটু চরিত্র,এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চ্যারকেটু সম্পর্কে যা আলোচনা করলাম তার থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে চ্যারকেটু চরিত্রটি অবশ্যই নিম্নবর্গের অন্তর্গত একটি চরিত্র।

এবারে আমরা দেখব এই নিম্নবর্গের অন্তর্গত চ্যারকেটু চরিত্রটি সমাজের উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা কেমন ভাবে অবদমিত, উচ্চবর্গের আধিপত্যাধীণ সে। সেই সঙ্গে এই এও দেখব যে চ্যারকেটু তো শুধুমাত্র উচ্চবর্গের দ্বারা অবদমিতই নয় কখনো কখনো সেও হয়ে উঠেছে এই উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার যা নিম্নবর্গের মানুষদের যে চেতনা বোধ সেই চেতনা বোধ থেকে জাত। আবার কেমন করেই বা উচ্চবর্গের এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে হয়েছে প্রতিবাদী। আবার নিম্নবর্গের তাত্ত্বিকেরা নিম্নবর্গের মানুষদের ক্ষেত্রে যে চেতনার কথা বলেছেন অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানুষদের চরিত্রের মধ্যে আমরা যেমন দেখি প্রভুশক্তির প্রতি তাদের সর্বদা মান্যতা বজায় রাখতে ঠিক এর পাশাপাশি তারা এর বিপরীতেও অবস্থান করে, হয়ে ওঠে প্রভুশক্তি বিরোধী, অর্থাৎ তাদের মধ্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা ক্রিয়াশীল থাকে। তারা যেমন উচ্চবর্গের দ্বারা অবদমিত ঠিক তেমনি তাদের প্রতিবাদ, চেতনাবোধের দিকটিকেও আমরা লক্ষ্য করি। এই উপন্যাসের মধ্যেও দেবেশ রায় চ্যারকেটুর সেই প্রতিবাদী রূপটিকে তুলে ধরেছেন উপন্যাসের কথাবয়ানে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অনুষঙ্গে।

পাটের লোনের প্রসঙ্গে আমরা দেখি চ্যারকেটু অঞ্চল অফিসের সেক্রেটারির কথামত ফর্ম এ সই করার আগে ভীষণ সচেতন ভাবেই সেক্রেটারিকে বলে গতসনে সে পাটের লোন নেয়নি। সেই সময়ে সেক্রেটারি তাকে বিষয়টি নাবুঝিয়েই সই করতে জোর করলে সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দরখাস্তে কি লেখা আছে আগে পড়ে শোনাবার জন্যে। চ্যারকেটু শুনে বুঝেই সই করতে রাজি হয়। এর মধ্যদিয়ে চ্যারকেটু চরিত্রের প্রতিবাদের দিকটিকেই তুলে ধরলেন দেবেশ রায়। হাটে যেকোনো রাজনৈতিক দলের মিটিং শুরু হলে শ্লোগানের পরই চ্যারকেটু সযত্নে সেই মিটিংকে এড়িয়ে চলে হাটে ঘুরে বেড়ায়। আসলে চ্যারকেটুর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পোষ্টার জোগাড় করা। তাই মিটিং এর শেষে আসে সে দুই একটা পোষ্টার পেলেই যথেষ্ট। আর মিটিং মানেইতো রাজনীতি, চাওয়া পাওয়ার প্রশ্ন, আর রাজনীতি মানেইতো সেটা উচ্চবর্গের সাথে জড়িত। তাই চ্যারকেটু প্রত্যাখ্যান করে সেই মিটিং তথা রাজনীতিকে। এই প্রত্যাখ্যান তো তার প্রতিবাদেরই আর এক ধরন।

চ্যারকেটু জেনেবুঝেই তার ভাঙ্গা গোয়াল ঘরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পোষ্টার লাগায় যা তার জীবনের সাথে একেবারেই বেমানান। যদিও এসব পোস্টারের মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষদেরকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে যুক্ত করবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও নিম্নবর্গের মানুষেরা বা বলাযেতে পারে চ্যারকেটুরা তাকে সচেতন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করে। চ্যারকেটুর এই পোষ্টার লাগানোর মধ্য দিয়েও যেন একধরনের প্রতিবাদেরই আভাস আমাদের সামনে উঠে আসে। দারোগা বাবু চ্যারকেটুকে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে দারোগা বাবুকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সে কোন পার্টির মানুষ নয় ।কোন ঝাণ্ডা তার নয়। এই কথপোকথনের ভাষাও তার প্রতিবাদেই ভাষা ।

শেষ পর্যন্ত তিনদিনের বাসি খিদের অসহ্য যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়েও কারো কাছে ধার বা ভিক্ষে না চেয়ে তাদের শেষ সম্বল গরুটিকে গৌরিহাটে বিক্রি করতে নিয়ে যায়। এর মধ্য দিয়েও তো তারা আধিপত্যবাদী প্রভুগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানায়। একদিকে আলোচ্য উপন্যাসেই আমরা দেখতে পাই রমণী পঞ্চায়েতের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষদের আর ঠিক তার বিপরীতে দিনের পর দিন না খেতে পাওয়া চ্যারকেতুদেরক। যারা একমুঠো খাবারের জন্য নিজেদের শেষ সম্বলটুকুকেও বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

পরবর্তীতে উপন্যাসের শেষদিকে আমরা দেখি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শ নিয়ে অনেক মিছিল ও বিভিন্ন দলের মানুষের মধ্যে নানারকম কথোপকথন। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বয়ানে আমাদের দেখিয়েছেন মিছিলের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণিবিভাজনের চিত্রকে। যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসের মিছিলে তাকে সামিল হতে হয়। এখানে মারক্সিয় তাত্ত্বিক আন্তনিও গ্রামসির কথাকে মনে পড়ে, সমাজের যে দুই পৃথক শ্রেণির কথা তিনি বলেছেন যার একদিকে ডমিন্যান্ট বা প্রভুত্বশ্রেণি আর তার বিপরীতে শোষিত শ্রেণি, সেই শ্রেণি বিভাজনকে মেনে নিয়েই মিছিলের মধ্যেও করা হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাজন। এই মিছিলেও চ্যারকেটুকে সামিল হতে হয় নিজের পুরোপুরি ইচ্ছের বিরুদ্ধে এবং অবশ্যই মিছিলের নিয়মকে মেনেই। যাকে প্রতিবেদনের প্রথমে বাসি খিদে মেটানোর জন্য বাড়ির শেষ সম্বল গরুটাকে বিক্রি করার জন্য কাকা খেতখেতু গৌরিহাটে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেদিন জলপাইগুড়ি জেলায় কংগ্রেসের জেলা কমিটি ভাঙ্গা এবং জেলায় অ্যাডহক কমিটি হবে কিনা তার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সামনে সরকারি কংগ্রেস ও বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের মধ্যে শক্তি দেখানোর তোড়জোর শুরু হয়। অন্যদিকে আবার ঐ দিনই জেলায় বিরোধী দলের আইন অমান্য আন্দোলন। ফলে এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে বাসি ক্ষিদে মেটানোর জন্য অসহায় চ্যারকেটুর বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া গরু হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের প্রতীক। যদিও দলের প্রধান নেঙ্গু বলেছিল তাকে গৌরিহাটে নামিয়ে দেবে। কিন্তু রাজনীতির উত্তেজনায় চ্যারকেটুর মত মানুষদের কাতর আকুতি শোনার বিন্দুমাত্র সময় যে নেই তা এখানে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। তাই চ্যারকেটু নেঙ্গু বা শেখরকে যতই বলুক –

> "হে বাবু মোক ছাড়িদেন কেনে, মোক গৌরিহাট যাবা নাগিবে, মোক এই গরুখান বেচিবার নাগিবে, মোক চাউল কিনিবার নাগিবে, মোর বাড়িত্ পাঁচ পাঁচখান না-খাউয়াইয়া মুখ বাবু, আজি গরুবেচা টাকা দিয়্যা চাউল কিনিলে উমরার খিদ্যা মিটিবে। বাবু, মোক ছাড়ি দ্যান কেনে। মোক গৌরিহাটত যাবা নাগিবে।"[১২]

চ্যারকেটুর এই করুন আর্তনাদ কেউ শোনেনি, আসলে আমাদের সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরা সমাজের এই নিম্নবর্গের মানুষদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই চিরকাল ব্যবহার করে এসেছে, তাদের কথার দিকে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করেনি। কিন্তু চ্যারকেটু প্রত্যাখ্যান করে মিছিলকে, মিছিলে সে থাকলেও মিছিল তার কাছে কোন গুরুত্ব পায়না, মিছিলের ঝাণ্ডা বা মিছিল কোনটারই অর্থ বুঝেনা সে। আসলে মিছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সবইতো উচ্চবর্গের সেখানে চ্যারকেটু একেবারেই বেমানান তাই সে মিছিলকে প্রত্যাখ্যান

করে নিজে গৌরিহাটে যেতে চায় খাদ্যের সন্ধান করতে। মিছিল তাকে ধরে রাখতে পারেনা সেই মিছিল থেকে সে হয়ে ওঠে একক স্বতন্ত্র সমসাময়িক সামুহিকতার অপর সত্তা other হিসেবে। একদিকে মিছিলের আর সবাই আর অন্যদিকে চ্যারকেটু একা তার গরুকে নিয়ে। সে প্রত্যাখ্যান করেছে সেই রাজনীতির মিছিলকে। তার এই মিছিল ত্যাগকরার মধ্যে দিয়েও যেন আমরা তার প্রতিবাদী চরিত্রটিকেই খুঁজে পাই। আসলে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিপরীতে স্বতসিদ্ধভাবে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ইতিহাসও যে বজায় ছিল সেই কথাকেই দেবেশ রায় আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাইতো চ্যারকেটু মিছিল ত্যাগের মধ্যদিয়ে উচ্চবর্গের রাজনিতিকেই প্রত্যাখ্যান করল। তাইতো দারোগা বাবু চ্যারকেটুকে কোন পার্টির লোক জানতে চাইলে চ্যারকেটু বলে ওঠে–

> "কুনো পার্টি না হয় বাবু"[১৩]

আবার তার হাতের ঝাণ্ডা কার জিজ্ঞেস করলে সে বলে –

> "কারো ঝাণ্ডা নাহয় বাবু।" চ্যারকেটু সমস্ত কিছুকেই অস্বীকার করে। সে শুধুই একা, তার কোন পার্টি নেই, নেই কোন মিছিল, নেই কোন ঝাণ্ডা।[১৪]

এমনিভাবেই আমরা দেখতে পাই চ্যারকেটুর মধ্যে সচেতনতা বোধ। আধিপত্যবাদী প্রতাপে নিম্নবর্গ চিরকাল প্রত্যাখ্যাত। ফলে তাদের ভালো মন্দ, সত্য-মিথ্যা সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে প্রভুশক্তি। কিন্তু তবুও নিপীড়িত নিম্নবর্গের উপস্থিতি কোনোদিনই পুরোপুরি হারিয়ে যায়না। তাই সাহিত্যের প্রতিবেদনে নিম্নবর্গের কথা নানাভাবে উঠেআসে। ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় সেই নিম্নবর্গের মানুষের কথাই, তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথাকেই তুলে ধরলেন আলোচ্য উপন্যাসের প্রতিবেদনের মধ্যদিয়ে।

সূত্র নির্দেশ

১। রায় দেবেশ, 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ১৯৮৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা:১১৭
২। তদেব, পৃষ্ঠা: ১২,১৩
৩। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩
৪। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫
৫। রায় দেবেশ, 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ১৯৮৯, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা: ৭৬
৬। তদেব, পৃষ্ঠা: ৭৬
৭। তদেব, পৃষ্ঠা: ৩৬
৮। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫
৯। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫
১০। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫৫
১১ । তদেব, পৃষ্ঠা: ১৭৯
১২ । রায় দেবেশ, 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' পরিবর্ধিত দে'জ সংস্করণ, ১৯৮৯, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা: ১৯০
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯০
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯০